নীলনদের স্রোত বেয়ে প্রাচীন মিশর দর্শন

রাজর্ষি পাল

ইংল্যান্ড প্রবাসী চিকিৎসক

২০২৪ সালের মে মাসে মিশর যাওয়ার সুযোগ এল। হুড়গাডায় রেড সীতে স্কুবা ডাইভিং শেষ করে আর্কিওলজিক্যাল ট্যুর।

২০২০ সালে মিশর এসেছিলাম। কায়রো এবং গিজার পিরামিড দেখে পৌঁছেছিলাম দক্ষিণে নীলনদের পাড়ে আসওয়ান শহরে। সেখানে ফিলাই টেম্পল দেখার পরই খবর এল কোভিডের আক্রমণ ঠেকাতে ইজিপ্ট গভর্নমেন্ট জারি করতে চলেছে লক ডাউন। তখনই ফিরে আসতে হয়েছিল। এবারে সুযোগ পেলাম অসম্পূর্ণ যাত্রাপথ সম্পূর্ণ করতে।

হুড়গাডা থেকে এয়ার-কায়রোর প্লেনে কায়রো। এয়ারপোর্টের লাগোয়া হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে বিমানে ইতিহাসের গরিমামণ্ডিত আসওয়ান। নীলনদের ওপরে ক্রুজ জাহাজ বেয়ে পরবর্তী তিনদিন ধরে লাক্সর যাত্রা। মিশরের প্রাচীন রাজধানী লাক্সর। প্রাচীন নাম থেবস। থামতে থামতে চলল জাহাজ। জাহাজ থেকে নেমে প্রাচীন মিশরের মন্দির এবং প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন— হারিয়ে যাওয়া কালের মন্দিরায়, টাইম মেশিন চেপে যেন ফিরে যাওয়া সাড়ে তিন হাজার বছর আগের মিশরে।

মিশরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। হাজার পাঁচেক বছর আগের উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মিশরের ইতিহাস আরও বহু হাজার বছরের প্রাচীন। কোথা থেকে এই সভ্যতার অভ্যুদয় হল তা রহস্যে ঢাকা। নীলনদের উর্বর নদী-উপত্যকায় বিকাশলাভ করেছিল এই সভ্যতা। প্রাচুর্য, বৈভব, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যায় উৎকর্ষের চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছেছিল মিশর। ফারাও, গ্রিক, রোমানদের রাজত্বের পর তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসে মিশর।

ফিলাই টেম্পল : ফিলাই টেম্পল কমপ্লেক্স মিশরের সবচেয়ে অনন্য এবং ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে একটি। এটি নীলনদের একটি দ্বীপে অবস্থিত। কমপ্লেক্সটি মূলত দেবী আইসিসকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, যাঁকে মিশরের মাতৃমূর্তি এবং রক্ষক বলে বিশ্বাস করা হত। ফিলাইয়ের প্রাচীনতম মন্দিরটি ফারাও প্রথম

ফিলাই মন্দিরের প্রবেশপথ

নেকটেনেবো (৩৮০-৩৬২ খ্রিস্টপূর্ব)-র আমলে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। টলেমাইক যুগে (৩২৩-৩০ খ্রিস্টপূর্ব) অর্থাৎ গ্রিক শাসনপর্বে এই মন্দিরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল দ্বিতীয় টলেমি (২৮৫-২৪৬ খ্রিস্টপূর্ব) দ্বারা আইসিসকে উৎসর্গ করা একটি বৃহৎ মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণ। এখানে দুটি প্রধান মন্দির রয়েছে : একটি আইসিসকে উৎসর্গীকৃত এবং একটি ওসিরিসকে উৎসর্গীকৃত। এতে হোরাস এবং হাথোরের মতো দেবতাদের নিবেদিত কয়েকটি ছোট মন্দিরও ছিল।

রোমান যুগে (৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ—৩৯৫ খ্রিস্টাব্দ) ফিলাই-এ আরও পরিবর্তন হয়। সম্রাট অগাস্টাস দ্বিতীয় টলেমির নির্মিত পুরনো কাঠামোর উপরে আইসিসকে উৎসর্গীকৃত নতুন মন্দির কমপ্লেক্স তৈরি করেন। তিনি আরও কিছু কাঠামো যোগ করেন, যেমন গ্রন্থাগার, অ্যাম্ফিথিয়েটার এবং স্নানঘর।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে, আরবদের বিজয়ের পর এটিকে একটি ইসলামিক ধর্মস্থানে রূপান্তরিত করা হয় এবং অনেক প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করা হয়।

কিছু আদি মন্দির তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে অক্ষত ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ স্থাপত্যবিজ্ঞানীরা এই স্মৃতিস্তম্ভগুলির অনেকগুলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আজ ফিলাই টেম্পল কমপ্লেক্সকে মিশরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৬০ সালে আসওয়ানে নীলনদের ওপরে বাঁধ নির্মাণ হয়। বাঁধের জলাধারের তলায় তলিয়ে যায় ফিলাই এবং আবু সিম্বেল মন্দির। পরে ইউনেস্কো ফিলাই মন্দির এবং আবু সিম্বেলকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা শুরু করে। পাথরের পর পাথর, মূর্তির পর মূর্তি কেটে গোটা মন্দির কমপ্লেক্সকে পাশের আর এক উচ্চভূমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ফিলাই টেম্পল নীলনদের আর একটি দ্বীপে অবস্থিত।

নুবিয়ান গ্রাম : নুবিয়ানরা পৃথিবীর সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী। সেই প্রস্তরযুগের সময় থেকে আজও অনেকাংশে অপরিবর্তিত তাদের সংস্কৃতি। সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী এই নুবিয়ানরা। মিশরীয় সভ্যতায় এদের অবদান কম নয়। বর্তমানে মিশরের দক্ষিণ এবং সুদানের উত্তরে ছড়িয়ে আছে নুবিয়ানরা। অন্তত আট হাজার বছর আগের নুবিয়ান সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নুবিয়ানদের অন্য পরিচয় নীলনদে ওদের সাবলীল বিচরণ ও জলপথে বাণিজ্যিক আধিপত্য। ১৯৬০-এর দশকে আসওয়ানে নীলনদের ওপরে বাঁধ নির্মাণের ফলে নুবিয়ান গ্রামগুলি বাঁধের রিজার্ভারের জলে তলিয়ে যায়। নুবিয়ান সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য, মিশর সরকার নুবিয়ান জনগণকে একটি নতুন জায়গায় পুনর্বাসন দেয়, যা এখন আসওয়ান নুবিয়ান গ্রাম নামে পরিচিত। মজার ব্যাপার হল, নুবিয়ান পরিবারগুলি

তাদের বাড়িতে জীবিত কুমির রাখে। এই ঐতিহ্য সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। এটি শুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, মনে করা হয় কুমির পরিবারে সমৃদ্ধি আনবে। কুমিরগুলি যথেষ্ট বড় হয়ে গেলে তাদেরকে বাঁধের দক্ষিণে লেক নাসের অর্থাৎ নীলনদের জলাধারে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নীলনদ বেয়ে নুবিয়ানদের গ্রামে গেলাম। সুযোগ পেলাম এক নুবিয়ান পরিবারে অন্তরঙ্গভাবে মেশার। সৌজন্যে আমাদের গাইড হুসেন হোসনি। ২৯ মে বিকেলে আমাদের ক্রুজ থেকে বেরিয়ে নীলনদের ওপরে মাঝারি এক নৌকোতে উঠলাম, কিছুটা বজরা টাইপের। আরাম করে বসার জায়গা আছে, মাথার ওপরে ছাউনি। দাঁড় বেয়ে নীলনদে নৌকা বিহার, নুবিয়ান বাবা ও ছেলে মাল্লা। প্রখর গ্রীষ্ম, তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ওপর।

আসওয়ান শহরকে বাঁদিকে রেখে দক্ষিণে গিয়ে কৌণিকভাবে নীলনদ অতিক্রম করে অপর পাড়ে গিয়ে পাড় থেকে কিছুটা দূর দিয়ে ধীরগতিতে চলল বজরা। পাড়ে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়ের সারি, মরুভূমি। কোথাও গাছগাছালির সবুজ হালকা আভরণ। এক পাহাড়ের ওপরে আগা খানের সমাধি সৌধ। তার চারপাশে কিছুটা জায়গা জুড়ে গাছগাছালি। আগা খান ছিলেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, শিয়া ধর্মাবলম্বী নেতা। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা একসময়ে মিশর ও আরবের কিছু অংশে রাজত্ব করেছিলেন, পরিচিত ছিলেন ফতিমিদ রাজপরিবার নামে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল। আগা খানের চতুর্থ স্ত্রী ইভন ব্ল্যাচে ল্যাভরাউ ছিলেন হলিউডের ফরাসি অভিনেত্রী। আসওয়ান অঞ্চলে তাঁদের পরিবার অনেক সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করেন। বেগম আগা খানের মৃত্যু হলে তাঁকেও আগা খানের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

আরও দক্ষিণে চলল আমাদের বজরা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ, খাগড়া জাতীয় একধরনের গুল্মের জঙ্গলে ঢাকা। অনুমান করলাম এইগুলোই প্যাপিরাস। সুপ্রাচীন কাল থেকেই তুলোট লিপি এবং নৌকা বানানোর জন্য ব্যবহৃত হত। প্যাপিরাস থেকেই ইংরাজি 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি।

আরও কিছুটা এগিয়ে পাড়ে নোঙর করল আমাদের বজরা। বালুকাময় বেলাভূমি। টলটলে শীতল স্বচ্ছ নীলনদের জল। আমার সহযাত্রী কয়েকজন আমেরিকান এবং এক জার্মান দম্পতি। তারা বজরা থেকে নেমে পাড়ে ঘোরাঘুরি করল, পোশাক পালটে নীলনদের শীতল জলে স্নান করল। আমি সবে রেড সীতে স্কুবা ডাইভিং করে আসছি। আমার ইচ্ছে করল না আর জলে নামতে।

এরপর ফের নৌকাবিহার। আরও কিছুটা এগিয়ে থামল বজরা। এই সেই নুবিয়ান গ্রাম। পাড়ে নামলাম। পাড় বেয়ে ওপরে উঠে পাহাড়ের চড়াই রাস্তা বেয়ে ওপরে ওঠা। দুপাশে মূলত একতলা বাড়ি, বাড়ির বাইরের দেওয়াল চিত্রিত। বাজারের ভেতর দিয়ে চললাম। দুপাশে দোকানের সারি, আমাদের দেখতে কৌতূহলী জনতার ভিড়। আমাদের গাইড দেখলাম খুবই পরিচিত। অনেকেই অভিবাদন জানাচ্ছে বা যেচে এসে অ্যারাবিক ভাষায় কথা বলছে।

ঘুরপথে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে একটি বাড়ির সামনে পৌঁছলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো একতলা বাড়ি। পুরোটাই চিত্রিত। দরজা খোলা। বাড়ির ভেতরে সটান ঢুকে গেল গাইড, পেছন পেছন আমরা। সাড়া পেয়ে একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাড়ির কর্তা। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। রোগা চেহারা, মাথায় ফেজ টুপি। নাম রামাদান। নিজের ছোট দোকান আছে, নীলনদে নৌকাও চালান। নিজের হাতে গোটা বাড়ির ভেতরের বাইরের দেওয়াল জুড়ে ছবির পর ছবি এঁকেছেন রামাদান। ওঁর স্ত্রী পাড়া বেড়াতে গেছেন।

আমরা এসেছি শুনে তড়িঘড়ি চলে এলেন। নাম সালমা, মাথাঢাকা হিজাব। দুজনেই অমায়িক। গল্প করতে ভালবাসেন। হুসেন দোভাষীর কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। রামাদান-সালমার চার মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক মেয়ে আসওয়ান শহরে নার্সিং ট্রেনিং নিচ্ছে। ছোট মেয়ে স্কুলে যায়।

দুটো বিশাল থালা ভর্তি খাবার নিয়ে এলেন সালমা। বাড়িতে বানানো সিসেম অর্থাৎ তিল পিষে বানানো বান-রুটি, চিজ এবং আখের গুড়। ভাগাভাগি করে কিছুটা খেলাম আমরা। পিতলের ছোট গ্লাসে করে চা।

এরপর আমাদের দেখালেন বাড়িতে পোষা কুমির। আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখানেই এক ছোট চৌবাচ্চাতে দুটো বাচ্চা কুমির। একটাকে আলতো করে তুলে এনে মুখে রাবার ব্যান্ড লাগিয়ে দিলেন রামাদান, যাতে কামড়াতে না পারে। আমরা হাত বদল করে করে কুমির-ছানা হাতে নিলাম।

বাড়ির অন্যদিকে বড় চৌবাচ্চায় দুটো প্রমাণ সাইজের কুমির। চৌবাচ্চার মুখ ঢাকা গ্রিলের ঢাকনা দিয়ে। লাঠি দিয়ে রামাদান খোঁচা দিতেই বিশাল হাঁ করে বিরক্তি প্রকাশ করল তারা। কুমিরদের খাদ্য নীলনদের মাছ। বড় কুমির দুটোকে আরও কিছুদিন পর লেক নাসেরের জলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

নুবিয়ান বাড়িগুলির বিশেষত্ব হল, বাড়িগুলিতে দরজা থাকে না বা থাকলেও লাগানোর প্রয়োজন হয় না। কারণ ওদের সমাজে চুরি করা কাকে বলে জানা নেই। আর, বাড়িগুলির ছাদ কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে রাখা, ছায়াটুকু হলেই হল, কারণ মিশর মরুভূমির দেশ, বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে, হলেও ছিঁটেফোঁটা।

এবার ফিরতে হবে। রামাদান আর সালমাকে বিদায় জানিয়ে বেরোলাম। হুসেন দুটো মোটর চালিত ভ্যান দাঁড় করাল, কাঠের সিট লাগানো। এগুলোই এখানে রিক্সা বা অটোর বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভাগাভাগি করে বসলাম। গ্রামের গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলে এলাম পাহাড়ের একদম ওপরে। অভূতপূর্ব দৃশ্য। পশ্চিমে মরুভূমির ওপর অস্তগামী সূর্য। পূর্বে অনেক নিচে নীলনদ, নাইল ভ্যালি। দক্ষিণে দূরে আসওয়ান হাই ড্যাম। পায়ের তলায় খাড়া নেমে গেছে উপত্যকা, নীলনদের পাড়ে। নদীর ওপারে উত্তর-পূর্বদিকে বহুদূরে আসওয়ান শহর।

ফেরা ভ্যানগাড়িতেই। বজরায় নীলনদের স্রোত বেয়ে এবার ফিরে চলা। রাত্রি নামছে। আবহমান কাল ধরে এই নীলনদ বেয়ে কত নৌকা, বজরা চলাচল করেছে। স্তব্ধ ইতিহাসের ছায়াময় ক্রমবিবর্তন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

''কথা কও, কথা কও।/ অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও?...

যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগরতলে,/ কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে।''

কুমির-ছানা হাতে লেখক

আসওয়ান শহরের কাছাকাছি এসে গিয়েছি। পাড়ে এক গরিমাময় হোটেল, 'ওল্ড ক্যাটারাক্ট'। এখানে বসেই আগাথা ক্রিস্টি লিখেছিলেন রহস্য উপন্যাস 'ডেথ অন দ্য নাইল'।

মিশর-সুদানের সীমান্তের

কাছাকাছি অবস্থিত রহস্যময় মন্দির কমপ্লেক্স আবু সিম্বেল। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কাদেশ অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়ার যুদ্ধে দ্বিতীয় রামেসিস হিট্টাইটদের পরাজিত করেছিলেন। এই বিজয়কে স্মরণীয় করার জন্য তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে উৎসর্গ করেছিলেন কনিষ্ঠতমা স্ত্রী নেফারতারিকে। আসওয়ান থেকে তিন ঘণ্টার পথ আবু সিম্বেল। হাজার দুয়েক বছর মরুভূমির বালির নিচে চাপা পড়েছিল এটি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে খোঁজ পেয়ে বালুকারাশির তলা থেকে উদ্ধার করা হয় এই অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য। বড় মন্দিরে রামেসিসের নিজের এবং তাঁর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের জন্য উৎসর্গীকৃত কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। শেষ কক্ষটি গর্ভগৃহ, বছরে দুদিন ছাড়া প্রতিদিনই অন্ধকার থাকে। দ্বিতীয় মন্দিরটি তুলনায় ছোট, দেবী হাথোরকে নিবেদিত। এটি রামেসিসের স্ত্রী নেফারতারির সম্মানে নির্মিত হয়েছিল। এটি হাথোর এবং নেফারতারির মন্দির নামেও পরিচিত।

বৃহত্তর মন্দিরটিতে বছরে দুবার সূর্যালোক গর্ভগৃহে রামেসিসের মূর্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের মূর্তিকে আলোকিত করে। এটি স্থাপত্যবিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মন্দিরটি এমনভাবে নির্মিত যাতে শুধুমাত্র ২২ ফেব্রুয়ারি—রামেসিসের সিংহাসনে আরোহণের বার্ষিকী এবং ২২ অক্টোবর —তাঁর জন্মদিনে সূর্যের আলো গর্ভগৃহে পৌঁছয়।

গর্ভগৃহে চারটি মূর্তি। দেখা যায় রামেসিস (অন্যান্য ফারাওদের মতো তিনিও নিজেকে দেবতা মনে করতেন), রা (সূর্যের দেবতা), আম্মোন (দেবতাদের রাজা)-কে। চতুর্থ মূর্তিটি অন্ধকারে রয়ে গেছে কারণ এটি অন্ধকারের দেবতা পতাহকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই মূর্তিটি সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি সময় সূর্যের আলো দেখেনি।

বছরের ওই দুদিন সারা পৃথিবী থেকে পর্যটকরা আবু সিম্বেল আসেন সূর্যালোকে আলোকিত মূর্তি দর্শন করতে। এই দর্শন অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

এডফু মন্দির : দেবতা হোরাসকে উৎসর্গীকৃত, নীলনদের পশ্চিমে একটি পাহাড়ে অবস্থিত এডফুর মন্দিরটি প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বোত্তম সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত। ২৩৭ ও ৫৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে গ্রিক রাজাদের সময় নির্মিত হয় এটি। দু-হাজার বছর ধরে মন্দিরের কাঠামো প্রায় চল্লিশ ফুট গভীর মরুভূমির বালি এবং নীলনদের পলির নিচে চাপা পড়েছিল। এর ফলে মন্দিরটি

আবু সিম্বেল মন্দির

অবিশ্বাস্যভাবে সংরক্ষিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হোরাস অর্থাৎ ফ্যালকন বা বাজপাখি দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত এই মন্দির। বাজপাখির মাথাযুক্ত দেবতার মূর্তি গোটা কমপ্লেক্স জুড়ে দেখা যায়। মন্দিরের দেওয়ালচিত্র থেকে গ্রিক রাজত্বকাল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

কম ওম্বোর মন্দির

কম ওম্বোর মন্দির : এটি দ্বৈত মন্দির—কুমির-মাথাযুক্ত দেবতা সোবেক ও বাজপাখির মাথাওয়ালা দেবতা হোরাসকে উৎসর্গীকৃত। গ্রিক আমলে ১৮০-৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়েছিল এটি। এর বেশিরভাগ অংশ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেলেও এটি আংশিকভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছিল। এখানে প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতগণ সূক্ষ্ম এবং জটিল অস্ত্রোপচার করতেন। প্রাচীন অস্ত্রোপচারের যন্ত্রগুলি মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা আছে। আশ্চর্য লাগে,শল্যচিকিৎসার এই সুপ্রাচীন যন্ত্রগুলির কোনও কোনওটি আজও ব্যবহৃত হয়।

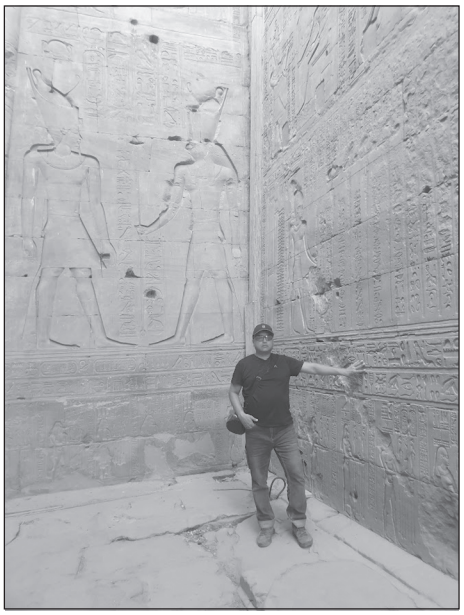
এডফু মন্দিরের ভেতরে লেখক

কুমির জাদুঘর : কিছুদিন আগে পর্যন্ত নীলনদে ‘নাইল ক্রকোডাইল’ বা কুমির দেখা যেত। আসওয়ান-এ বাঁধ দেওয়ার পর থেকে বাঁধের দক্ষিণে নীলনদে আর কুমির দেখা যায় না। তবে বাঁধের উত্তরে নীলনদের সুবিশাল রিজার্ভারে কুমির আছে। এই রিজার্ভার পরিচিত লেক নাসের নামে, মিশরের পূর্বতন প্রেসিডেন্টের নামে। প্রাচীন কাল থেকেই কুমির মিশরীয়দের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করত। প্রাচীন বিশ্বাস ছিল, যদি তারা প্রাণীটির উপাসনা করে তবে ওরা আক্রমণ করবে না। সেই উদ্দেশ্যে কম ওম্বোতে মিশরীয়রা স্থাপন করেছিল কুমির দেবতা বা সোবেকের উদ্দেশে নিবেদিত মন্দির। এখানে বিভিন্ন মাপের কুমিরের মমি কফিনে করে আজও সাজানো আছে।

কর্নাক মন্দির, লাক্সর : প্রাচীন শহর লাক্সরের কর্নাক মন্দির এক বিশাল কমপ্লেক্স। এখানে বংশ পরম্পরায় ফারাওরা নিজস্ব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন অন্তত দু-হাজার বছর ধরে। গ্রিক শাসকরাও তাঁদের মন্দির এখানে স্থাপন করেন। ২০৮০-১৬৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং প্রাথমিক খ্রিস্টীয়

যুগে এই মন্দির অঞ্চলটির বিকাশ ঘটে।

সুবিশাল মন্দির কমপ্লেক্স, সেইসঙ্গে বিভিন্ন স্থাপত্য, শৈল্পিক ও ভাষাগত বিবরণের কারণে কর্নাক মন্দিরকে এক অমূল্য ঐতিহাসিক পীঠস্থান এবং প্রাচীন মিশরের বিবর্তন অবলোকন করার এক আশ্চর্য পীঠস্থান হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি ২৪৭ একর জুড়ে বিস্তৃত। দেবতা আমুনকে উৎসর্গ করে এই মন্দির নির্মিত হয় ১৯৬৫-১৯২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ হাজার চারেক বছর আগে। গ্রিক রাজবংশ (৩০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা আরও বিস্তৃত হয়েছিল এই মন্দির কমপ্লেক্স।

বিশাল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, স্ফিংস, পিলার এবং তোরণগুলি যেন বিশাল এক গোলকধাঁধা। গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক স্থানগুলির মধ্যে একটি হল আমুন-রা মন্দির। জটিল স্থাপত্যের এই মন্দিরে ছিল বিশাল গর্ভগৃহ, সুউচ্চ তোরণ এবং পিলারের সারি। দেড় হাজার বছর আগে ভূমিকম্পে অনেকগুলি তোরণ ধ্বংস হয়। এখনও যেগুলি আছে সেগুলি সম্ভ্রম জাগানোর জন্য যথেষ্ট। কর্নাকের মন্দির নিছক এক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়। এটি প্রাচীন মিশরের আত্মার বহিঃপ্রকাশ। এখানে প্রবেশ করলে সহস্রাব্দ-প্রাচীন মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও যেন বাতাসে এবং সুপ্রাচীন স্তম্ভগুলিতে অনুরণিত হয়।

লাক্সর মন্দির এবং ভ্যালি অফ কিংস সহ, কর্নাক মন্দির ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।

লাক্সর মন্দির : প্রাচীন শহর থেবস (বর্তমান লাক্সর) বা লাক্সর মন্দিরটি তিন হাজার পাঁচশো বছর পরেও দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের ভ্রূকুটি অবজ্ঞা করে। এই ঐতিহাসিক মন্দির কমপ্লেক্সটি দেড় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরের রাজধানী থেবসে নির্মিত হয়েছিল। সে ছিল প্রাচীন মিশরের সুবর্ণ যুগ। মন্দিরটি দক্ষিণ মিশরের নীলনদের পূর্বতীরে।

১৩৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় আমেনহোটেপ-এর শাসনকালে এর নির্মাণ শুরু হয় (তিনি মিশরের ইতিহাসের অন্যতম সেরা আর্কিটেক্ট) এবং দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে, ১২১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শেষ হয়। পরেও আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মতো বহিরাগত বিজয়ীদের এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য ফারাওদের দ্বারা ক্রমাগত পুনর্গঠিত হতে থাকে।

লাক্সর মন্দিরটি মিশরীয় দেবতাদের রাজা আমুন-রাকে উৎসর্গীকৃত। এখানে ফারাওদের রাজ্যাভিষেক হত এবং ফারাওদের পুনর্জন্মের পীঠস্থান হিসাবে এটি বিবেচিত হত।

যখন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, তখন কোনও

কর্নাক মন্দির

লাক্সর মন্দির

বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্র বা ভারবাহী যান ছিল না। জনগণের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে অত্যাশ্চর্য নির্মাণটি সম্পূর্ণ হয়েছিল।

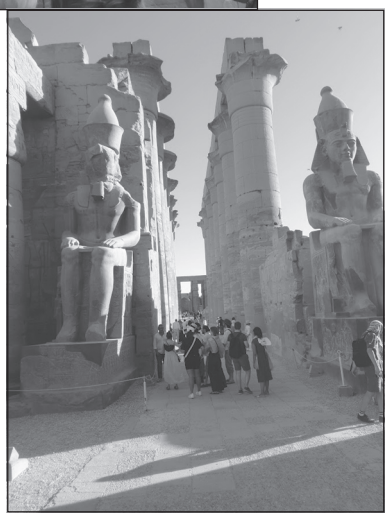

ভ্যালি অফ কিংস : লাক্সরের পশ্চিম তীরে ভ্যালি অফ কিংস-এ ২১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫৫০-১০৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অবধি ছিল ফারাওদের সমাধিস্থল। পিরামিড আকৃতির পর্বতশিখর আল-কুরআনের পাদদেশে জনহীন ও বিচ্ছিন্ন পার্বত্য উপত্যকাটিকে ফারাওরা বেছে নিয়েছিলেন রাজকীয় সমাধিস্থল হিসাবে।

একসময় এই অঞ্চলকে গ্রেট নেক্রোপলিস বা সত্যের স্থান বলা হত। ভ্যালি অফ কিংস-এ তেষট্টিটি রাজসমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও অন্তত চল্লিশটি এখনও আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সমাধিগুলি প্রাচীনকালে গুপ্তধনশিকারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গণ-পর্যটনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই উপত্যকাটি মিশরের দক্ষিণার্ধে নীলনদের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত। সমাধিগুলি পাহাড়ের গভীরে খোদাই করে তৈরি হয়েছিল। বেশিরভাগ সমাধিস্থলেই দীর্ঘ সুড়ঙ্গ এবং কয়েকটি করে চেম্বার রয়েছে। অনেক সমাধির দেওয়ালে চিত্রলিপিতে ফারাও এবং প্রাচীন মিশরীয় দেবতাদের ছবি আঁকা বা খোদাই করা আছে।

দীর্ঘতম সমাধিটি রানি হ্যাটশেপসুটের। সমাধির প্রবেশদ্বার থেকে তার সমাধিকক্ষটি প্রায় ৭০০ ফুট (২১৫ মিটার) দূরে। সবচেয়ে বড় সমাধিটি রাজা দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্রদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এর দুটি স্তর রয়েছে, স্তম্ভ সহ একটি কেন্দ্রীয় হল এবং অনেকগুলি সুড়ঙ্গ এবং চেম্বার রয়েছে।

১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রায় সমস্ত সমাধি এবং মমির সন্ধান পাওয়া গেছে এখন অবধি। ধনসম্পদ অন্য ফারাওদের দ্বারা পুনর্ব্যবহৃত হয়েছিল বা চুরি হয়েছিল। শুধুমাত্র রাজা তুতানখামেনের সমাধিটি অনাবিষ্কৃত ছিল। ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার ১৯২২ সালে এটি আবিষ্কার করেন। ১৯৭৯ সালে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (UNESCO) উপত্যকাটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে।

দেইর এল-বাহরিতে বেলেপাথরের পাহাড়ের

মধ্যে নির্মিত রানি হ্যাটশেপসুটের বিশাল সমাধি মন্দির। তিনি ছিলেন প্রাচীন মিশরের একমাত্র মহিলা ফারাও যিনি দুই দশকের ওপর রাজত্ব করেন খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শতকের মাঝামাঝি। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অজানা ছিল হ্যাটশেপসুটের বিবরণ কারণ তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁর স্মৃতি মুছে দেওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় রামেসিস-এর মূর্তি

এই সমাধিমন্দির এক আর্কিওলজিক্যাল বিস্ময়। হ্যাটশেপসুটের শাসনকালের ইতিহাস জানা যায় মন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত ফ্রেসকো বা দেওয়াল-চিত্রের মাধ্যমে। জানা যায়, তাঁর আমলে মিশরের সঙ্গে দূরবর্তী দেশ ইথিওপিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার উপনিবেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই সমাধিমন্দির দেবতা আমুনকে উৎসর্গীকৃত। তিনি সেইসময় সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবতা, যিনি পরবর্তী শাসকদের ত্রাস হিসেবে বিবেচিত হতেন। হ্যাটশেপসুটকে কিন্তু তাঁর সমাধিমন্দিরে সমাহিত করা হয়নি, ভ্যালি অফ কিংস-এ সমাহিত করা হয়েছিল তাঁর পিতার দেহাবশেষের সঙ্গে।

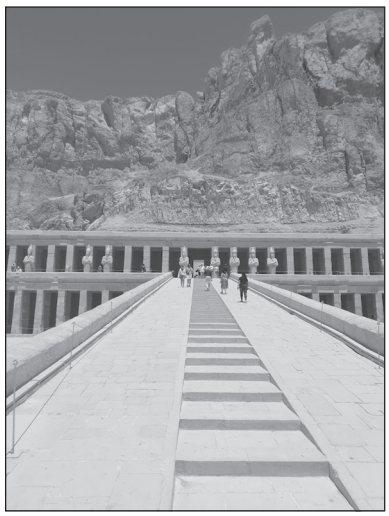

রানি হ্যাটশেপসুটের সমাধিমন্দির

হ্যাটশেপসুটের মন্দিরটি পরবর্তী সময়ে বিকৃত ও ভাঙচুর করা হয়েছিল। তাঁর সৎপুত্র এবং ভাগ্নে তৃতীয় থুটমোস সমগ্র মিশর থেকে তাঁর মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ এবং মূর্তি ধ্বংস করেন। পরে ফারাও আখেনাতেন মন্দিরটি আরও ভাঙচুর করেন।

মেমননের মূর্তি : চোদ্দো মিটার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু দুটি মুখবিহীন মূর্তি, বহুদূর থেকে লাক্সরে নীলনদের পশ্চিম পাড়ে দেখা যায়। সম্ভবত ফারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের মূর্তি এ-দুটি। হাজার টনেরও বেশি ভারি পাথর একটার ওপরে আর একটা গেঁথে মূর্তির নিখুঁত অবয়ব তৈরি হয়েছিল সুদূর অতীতে। কোন প্রক্রিয়ায় মিশরীয়রা এই অসাধ্যসাধন করেছিল তা আজও বিস্ময়ের।

ফারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের সমাধি-মন্দিরের পূর্ব প্রবেশদ্বারে বসেছিল এই মূর্তি দুটি। দু-হাজার বছর আগেও এরা পর্যটকদের আকর্ষণ করত, সুপ্রাচীন গ্রিস এবং রোমান সাম্রাজ্য থেকে পর্যটকরা আসত এই অঞ্চলে। মূর্তিগুলিকে তারা মনে করত মেমননের মূর্তি। মেমনন ছিলেন আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার রাজা যিনি ট্রয়ের যুদ্ধে অ্যাকিলিসের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

সূর্যোদয়ের সময় উত্তরের মূর্তিটি থেকে বংশীধ্বনির মতন শব্দ শোনা যেত যার

বর্ণনা আছে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান কাব্যে। গ্রিক এবং রোমানরা এই শব্দ শোনাকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করত। তারা বিশ্বাস করত এই ধ্বনি মেমননের কান্না, তার মাতা ইওস অর্থাৎ ভোরের দেবীকে অভিবাদন জানানোর জন্য। ইওস মেমননের অকালমৃত্যুতে শিশিরের অশ্রুতে কাঁদতেন।

এই ধ্বনি উঠত সম্ভবত কলোসাসের উপরের অংশে একটি ফাটলের কারণে। ২৭ খ্রিস্টপূর্বে ভূমিকম্পে এই ফাটলের সৃষ্টি হয়। সকালে সূর্যের তাপে ফাটলের ভিতরে শিশিরভেজা বালিকণা উত্তপ্ত ও অনুরণিত হয়ে এই ধ্বনির সৃষ্টি হত মনে করা হয়।

রোমান সম্রাট সেপ্টিমাস সেভেরাস (১৯৩-২১১ খ্রিস্টাব্দ) তৃতীয় শতাব্দীতে মূর্তিটি মেরামত করার পরে, মেমননের কান্না আর শোনা যায়নি।

ফারাও-এর অভিশাপ : ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে লাক্সর-এ নীলনদের পশ্চিম পাড়ে আবিষ্কৃত হয় তুতানখামেনের সমাধি, ভ্যালি অফ কিংস-এ, আর্কিওলজিস্ট হাওয়ার্ড কার্টার-এর নেতৃত্বে। আশ্চর্যজনকভাবে পিরামিড-লুঠেরাদের ধোঁকা দিয়ে সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে গুপ্ত ও অবিকৃত থাকে তুতানখামেনের গুপ্ত সমাধি। বিস্ময়করভাবে কার্টার সহ বেশ কয়েকজন আর্কিওলজিস্ট, যাঁরা প্রথম ঢুকেছিলেন এই সমাধিতে, সমাধি আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যে পরপর মারা যান। স্থানীয় বিশ্বাস, এই মৃত্যু অভিশপ্ত সমাধিতে ঢোকার প্রতিফল।

তরুণ ফারাও তুতানখামেনের মৃত্যুও রহস্যময়। ফরেনসিক আর্কিওলজিস্টদের মতে তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, অপঘাতে মৃত্যু। তাঁর মাথায় এবং ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন আছে।

তুতানখামেন ফারাও হন তাঁর মা নেফারতিতির মৃত্যুর পর। তিনি ছিলেন মিশরের রানি, তাঁর হাতেই ছিল শাসনক্ষমতা। তাঁর সমাধি বা মমি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভ্যালি অফ কুইন্স-এ কোনও গোপন জায়গায় হয়তো পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। কিছু আর্কিওলজিস্টের ধারণা, তুতানখামেনের সমাধিরই আরও ভেতরে, কোনও গোপন চেম্বারে লুকনো আছে নেফারতিতির সমাধি। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সোনার (sonar) দিয়ে সন্ধান চলছে।

শোনা যায় স্থানীয় মিশরীয়দের কারও কারও কাছে গুপ্ত সমাধিস্থলের অবস্থান বংশপরম্পরায় এখনও জানা আছে যা তারা বহিরাগতদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। হাওয়ার্ড কার্টার তুতানখামেনের সমাধিস্থলের সন্ধান পান এক প্রাচীন প্যাপিরাস লিপি থেকে। শোনা যায় এই লিপির সন্ধান তাঁকে দিয়েছিল এক মিশরীয় মালবাহক যা তার পরিবারের কাছে বংশপরম্পরায় সুরক্ষিত ছিল। পাঁচ বছর ধরে কার্টারের সঙ্গে কাজ করার পর যখন তিনি তার বিশ্বাস অর্জন করেন তখনই নাকি সেই লিপির সন্ধান সে তাঁকে দেয়।

হাওয়ার্ড কার্টারের অভিযানের স্পনসর ছিলেন ব্রিটেনের জমিদার আর্ল কার্নারভন। কার্টারের সঙ্গে তিনি প্রথম এই সমাধিকক্ষে প্রবেশ করেন ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসের চার তারিখে। সাড়ে তিন হাজার বছর পর অন্ধকার এই সমাধিকক্ষ ফের পৃথিবীর আলো দেখল। অনাবিষ্কৃত এই সমাধিতে তুতানখামেনের মমির সঙ্গে সংরক্ষিত ছিল থরে থরে শিল্পকর্ম, শিলালিপি, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, আসবাব এবং সোনার গয়না। শুধু সোনার গয়নারই ওজন ছিল দুশো কিলোর উপর।

ফারাও তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই সঙ্গে সমাধিতে প্রবেশ করার সাহস যারা দেখিয়েছে তাদের ওপর ফারাওয়ের অভিশাপ সম্পর্কে গুজব

ছড়িয়ে পড়ে। সমাধিকক্ষের দেওয়াললিপিতে নাকি এই সতর্কবার্তা খোদাই করা ছিল। এই আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই আচমকা কায়রোতে আর্ল কার্নারভনের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স তখন মাত্র ছাপান্ন বছর। অদ্ভুতভাবে সেই রাতে গোটা কায়রো শহরের সমস্ত আলো নিভে গিয়েছিল। এতে ফারাওয়ের অভিশাপের গুজব আরও জোরালো হল। পরবর্তী বছরগুলিতে পরপর মৃত্যু এই গুজবকে আরও শক্তিশালী করেছিল। হাওয়ার্ড কার্টারের অভিযাত্রীদলের বেশ কিছু সদস্য মৃত্যুবরণ করলেন পরবর্তী বছরগুলিতে। অভিশাপের আওতায় ছিলেন মিশরের প্রিন্স আলি কামেন ফাহমি বে, ১৯২৩ সালে তাঁর স্ত্রী বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। স্যার আর্চিবল্ড ডগলাস রিড, যিনি মমির এক্সরে করেছিলেন, ১৯২৪ সালে রহস্যজনকভাবে মারা যান। স্যার লি স্ট্যাক, সুদানের গভর্নর-জেনারেল ওই বছরই কায়রোতে নিহত হন। কার্টারের খননকারী দলের আর্থার মেস, ১৯২৮ সালে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় মারা যান। কার্টারের সেক্রেটারি রিচার্ড বেথেল, ১৯২৯ সালে ঘুমের মধ্যে মারা যান এবং তাঁর বাবা ১৯৩০ সালে আত্মহত্যা করেন।

কার্টার নিজে এই অভিশাপের গুজবকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের মার্চে চৌষট্টি বছর বয়সে লন্ডনের ফ্ল্যাটে একাকিত্ব এবং হতাশায় ভুগতে থাকা কার্টারের মৃত্যু হয়। হজকিনস ডিসিস নামে এক দুরারোগ্য রোগের কবলে পড়েছিলেন তিনি।

ভ্যালি অফ কিংস থেকে তুতানখামেনের মমি, আসবাবপত্র এবং জুয়েলারি সরিয়ে কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয় যা বর্তমানে সংরক্ষিত আছে কায়রো মিউজিয়ামে।

আমাদের নাইল ক্রুজ শেষ হল লাক্সরে ভ্যালি অফ কিংস ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখে।

আমার ফেরার প্লেন হুড়গাডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে, শনিবার রাত নটা নাগাদ। আর্কিওলজিক্যাল ট্যুর শেষ হল শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ। লাক্সর থেকে হুড়গাডা যাওয়ার একমাত্র উপায় সড়কপথ। নেই কোনও ট্রেন বা বিমান। সড়কপথে দূরত্ব তিনশো কিলোমিটারের ওপর। আছে বাস সার্ভিস। কিন্তু বাস যাবে থামতে থামতে, ঘণ্টা ছয়েক লেগে যেতে পারে। প্লেন মিস করে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই আগে থেকে বুক করে রেখেছিলাম প্রাইভেট ট্যাক্সি। খরচ সাপেক্ষ, কিন্তু এছাড়া গতি নেই।

লাক্সরে একটি ইজিপশিয়ান রেস্টুরেন্টে থামা হল মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। আমার সময় সীমিত। খাবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে প্যাক করে দিল। অন্যদের বিদায় জানিয়ে বেশ কয়েকটা জলের বোতল নিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলাম। তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রির কাছাকাছি। ঘণ্টা চারেকের সড়কপথে যাত্রা। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল। মরুভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে লাক্সর থেকে হুড়গাডা। মিশরের মরুভূমি এবং পর্বত খুবই কাছ থেকে দেখলাম। জনহীন ভূভাগ। মাঝখানে এক জায়গায় থেমেছিল আমাদের গাড়ি। পেট্রোল পাম্প আর লাগোয়া শপিং সেন্টার। অ্যারাবিক কফি খেয়ে ফের যাত্রা। অ্যারাবিক ছাড়া আর কোনও ভাষার চল নেই।

হুড়গাডার কাছাকাছি পৌঁছে পাহাড়ের ওপর থেকে বহুদূরে দেখা গেল রেড সী। সুনীল জলরাশি আর সুনীল আকাশ দিগন্তে মিলেমিশে একাকার। রেড সী-র সমান্তরালে হাইওয়ে দিয়ে আধঘণ্টাখানেক যাত্রা করে অবশেষে হুড়গাডা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরতিপথে লাক্সরের পথে যাত্রা করবে ড্রাইভার।